Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-2, Issue-iv, published on October 2022, Page No. 392–398
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর গ্রামের বাবা বুড়োরাজ আজও স্বমহিমায়

ড. সুজিতকুমার বিশ্বাস
গবেষক, গ্রামীণ ব্যবস্থাপনা
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
ই-মেল :

Keyword
জামালপুর, বুড়োরাজ, বুদ্ধপূর্ণিমা, পূন্যার্থী, ঐতিহাসিক, নিত্যপূজা, ধর্মীয়বিশ্বাস, মেলা, স্থানমাহাত্ম্য।

Abstract
পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর গ্রামের বুড়োরাজ মন্দিরে পুণ্যার্থীদের ঢল নামে। পুজো দেয় হাজার হাজার পুণ্যার্থী। শ্রাবণ মাসের প্রতি সোমবার বাবার মাথায় জল ঢালতে হাজির হন শয়ে শয়ে ভক্তরা। শতাব্দী প্রাচীন জাগ্রত এই মন্দিরে শ্রাবণের প্রতি সোমবারই প্রচুর পুণ্যার্থী পুজো দিতে আসেন। প্রসঙ্গত, জামালপুরের বুড়োরাজ মন্দির নিয়ে অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা রয়েছে। কথিত আছে, আনুমানিক ছ'শো বছর আগে এই অঞ্চল ছিল ঘন জঙ্গলে ঢাকা। সেই জঙ্গলে ছিল একটি উইয়ের ঢিপি। শোনা যায়, প্রতিদিন একটি গোরু সেই উইয়ের ঢিপির উপর এসে দাঁড়াত। আর আপনা থেকেই উইয়ের ঢিপির উপরে দুধ পড়ত। সেই গরুর মালিক যদু ঘোষ একদিন তার পিছু নিয়ে এই আশ্চর্য ঘটনা দেখে অবাক হয়েছিলেন। সেই রাতে তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, ওখানেই দেবতার অধিষ্ঠান। পরদিন সেখানে খোঁড়াখুঁড়ি শুরু করে শিবলিঙ্গ-গৌরীপট্ট সমেত পাথরের অদ্ভুত এক বিগ্রহ পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু, হাজার চেষ্টা করেও সেই বিগ্রহের শেষ পাওয়া যায়নি বলে সেটি সরানো সম্ভব হয়নি। সেদিন রাতে যদু ঘোষ ফের এবং ওই গ্রামের এক ব্রাহ্মণ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় স্বপ্নাদেশ পান যে, সেই বিগ্রহটিকে ওই স্থান থেকে সরানো অসম্ভব। তাই সেখানেই তাঁকে প্রতিষ্ঠা করে নিত্যপুজোর ব্যবস্থা করতে চান। এরপর থেকেই বুড়োরাজ মন্দিরে মহাদেবের পুজো হয়ে আসছে। মন্দিরে ঢোকার মুখে এখন সুদৃশ্য তোরণ তৈরি হয়েছে। সেখানে শিবপার্বতী গণেশ এর মূর্তি সহ একদিকে সিংহ অপরদিকে ষাঁড়ের প্রতিকৃতি। কাছে যেতেই লক্ষ করা গেল প্রচুর পূজার বাটার দোকান, ফুল বেলপাতা, ফল, ছাঁচবাতসা, কলা, ধুতরা ফুল প্রভৃতি সহযোগে পূজার উপকরণ সাজানো হয়েছে। বহু মানুষ নিকটস্থ স্থানের ঘাট থেকে স্নান সেরে দণ্ডি কেটে মূল মন্দিরে আসছেন। মন্দিরের প্রবেশ পথ সরু। সেখানে পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য পৃথক পথের ব্যবস্থা। সেখানে ঘন্টা বাধা আছে। মন্দিরের গায়ে অনেক ফলক লাগানো আছে। সেখানে অনেকেই তাদের প্রিয়জনদের নাম লিখে রেখেছেন বাবা বুড়োরাজের মন্দিরের গায়ে। মন্দিরটি খড়ের চালা বিশিষ্ট। মাটির মেঝে। প্রাচীন বিশ্বাসে আজও মন্দিরের আধুনিক সংস্কার সাধিত হয় নি। অনেকেই গোপাল নিয়ে

আসেন। সাধুদের মেলা বসে যায়। স্থানীয় গাছের অংশে পাথর বেঁধে রাখার চল আছে। কয়েকজন মহিলাকে দেখলাম তারা নিজেদের বাড়ির শিব নিয়ে এখানে পূজা দিয়েছেন এবং প্রদর্শন করে বসে আছেন। এক কথায় স্থানের মাহাত্ম্য ও বিশ্বাস এসব দৃশ্য দেখে অনেকটাই বেড়ে যায়।

Discussion

পূর্ব পরিকল্পনা মতো আমরা পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরে চললাম বুড়োরাজ এর পবিত্র স্থান দর্শন করতে। আমরা রানাঘাট থেকে খুব সকালে অর্থাৎ আটটা নাগাদ বেরিয়ে পড়লাম একটা চোদ্দো সিটের গাড়ি করে। গাড়ি চলেছে রানাঘাট থেকে কৃষ্ণনগর, কৃষ্ণনগর থেকে নবদ্বীপ, নবদ্বীপ কাটোয়া। এবার আমরা সোজা চলেছি সেই বর্ধমানের বুড়োরাজের স্থানে। পথে যেতে যেতেই বিভিন্ন দৃশ্য চোখে পড়তে লাগল। একদিকে যারা বুড়োরাজ এর কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছে সেই সমস্ত ভক্তদের প্রচণ্ড ভিড় পথের দু'ধারে। নারী পুরুষ শিশুকিশোর সবাই দলে দলে এসেছেন পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন গ্রাম থেকে। এর মধ্যে নদিয়া জেলা থেকে প্রচুর মানুষ এসেছেন পুণ্য লাভের আশায়।

যে সমস্ত কাঠামো যুক্ত কালীমন্দির রাস্তার দুপাশে দেখা গেছে, গ্রামের সমস্ত বাড়িতে এই সব ভক্তরা আগে থেকে এসে রয়েছেন। সেই সমস্ত সন্ন্যাসীরা সন্ন্যাস গ্রহণ করে এই সব ঘরে বিশ্রাম করছেন এবং তাদের ব্রত পালন করছেন। সন্ন্যাসীগণ পূজা নিবেদন করেছিল একটি নির্দিষ্ট গঠনশৈলী মেনে। একটি কাঁসার থালায় আতপ চাল, কলা, বেলপাতা, দানাশস্য, প্রভৃতি দিয়ে পূজা নিবেদন করেছিল। অনেকেই মইপূজা দিয়ে। অর্থাৎ একটি মইয়ের উপর সাতটি বা নটি থালায় ভোগ নিবেদন করে থাকেন ভক্তরা। দুই জন ভক্ত সাদা ধুতি পরে মইটি মাথায় করে নিয়ে আসেন পূজার স্থলে এবং পূজা শেষে আবার মাথায় করে নিয়ে আসেন।

আমরা তাদের সাথে কথা বলে জেনেছি, অনেকে যেমন নতুন এসেছেন আবার অনেকে বংশ পরম্পরায় বছরের পর এসে চলেছেন এই ব্রত করতে। সকল ভক্তদের একসাথে দেখতেও বেশ ভালো লাগে। একাদশীর দিন এখানে এসে তারা সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন। এই কয়দিন এই গ্রামেই তারা থাকবেন। বুদ্ধপূর্ণিমার পরের দিন গলার পৈতে ঠাকুরের থানে সম্প্রদান করার পর তারা আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবে। এই নিমদহ বা জামালপুর গ্রামে এসে তারা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকেন। এককথায় এই কদিন গ্রামটি বেশ উৎসব মণ্ডিত হয়ে ওঠে। বুদ্ধপূর্ণিমার দিন এরা নিরামিষ ভাত বা খিচুড়ি খেয়ে নেবেন। গত কয়েকদিন শুধুমাত্র তরল খাবার খেয়ে এরা জীবন ধারণ করেছেন। পুরুষেরা একটা বস্ত্র, একটি গামছা এবং গলায় ধরা (পৈতে) নিয়ে থাকে। কুমারী, বিধবা, সধবা, মহিলা-প্রত্যেকে নতুন সুতির শাড়ি গামছা ও গলায় সাদা সুতোর পৈতে রাখেন। শিবের গাজনের ন্যায় বুড়োরাজের গাজন চৈত্র মাসে হয় না, বৈশাখী পূর্ণিমায় বুড়োরাজের গাজন হয়। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে যে কেউ সন্ন্যাসী হতে পারেন এখানে। মূল সন্ন্যাসীকে এক মাস ধরে হবিষ্যান্ন খেতে হয়। অন্যান্যেরা পূর্ণিমার পাঁচদিন বা সাতদিন আগে সন্ন্যাস ব্রত নেয়। কামানের দিন একবেলা নিরামিষ আহার ও পরদিন উত্তরীয় পরিধান উপলক্ষে হবিষ্যান্ন খান। ত্রয়োদশীতে সারাদিন উপবাস করে পুজোর পর রাতে ফলাহার গ্রহণ করে সবাই। এদিন গাজন বের হয়। চতুর্দ্দশীর দিন সারাদিন উপবাস থেকে সন্ধ্যায় বাণ ফোঁড়ানোর পর তরল খাদ্য (গুড় ও জল) গ্রহণ করা যায়। পূর্ণিমার দিন নিরামিষ খেতে হয়। প্রতিপদের দিন সেবায়েত ও মূলসন্ন্যাসী উত্তরীয় খুলে দেওয়ার পর বাবার মাথায় সন্ন্যাসীদের মঙ্গলকামনায়, মূলসন্ন্যাসীর উপস্থিতিতে ফুল চাপানো হয়। বাবার মাথা থেকে ফুল পড়লে সন্ন্যাসীদের ক্রিয়ার পরিসমাপ্তি ঘটে। যাত্রী, ভক্ত ও মানসিকদাতারা অনেকেই বুড়োরাজের কাছে আসেন প্রধানত রোগমুক্তির আশায়।

জামালপুরের সবথেকে পুরোনো মন্দির হল এই বাবা বুড়োরাজের মন্দির। দূরদূরান্ত থেকে বহু ভক্তের সমাগম ঘটে বাবার এই অলৌকিক মন্দিরে আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য। এখানকার শিবলিঙ্গটি দেখতে বেশ আশ্চর্যজনক কারণ এর কোনো শেষ আজও খুঁজে পাওয়া যায় নি। এই রহস্যময় মন্দির নির্মাণের পিছনেও রয়েছে এক অলৌকিক কাহিনি, যা হয়তো অনেকেই জানেন না। এখানে ধর্মরা জ রূপে অধিষ্ঠিত রয়েছে বাবা বুড়োরাজ। জানা যায়, একসময় নাকি এই এলাকা গভীর জঙ্গলে ঢাকা ছিল। ধর্মরাজের প্রকৃত স্বরূপ যাই হোক না কেন, কেউ কেউ তাঁকে বুদ্ধ বলে প্রমাণ করেছেন। ধর্মপূজা বিধানে তাঁকে সূর্য ও বলা হয়েছে। কেউ আবার বরুণ বলেছেন, কারও কাব্যে ধর্মরাজ ও নারায়ণ অভিন্ন।

পৌরাণিক শিবের মধ্যে বৈদিক রুদ্রদেবের আরাধনার প্রসঙ্গে কিছু প্রকাশ অনেকেই দেখতে পেয়েছেন। এই ভাবেই আর্য ও আর্যেতর জাতি গোষ্ঠীর দ্বারা পুজিত হয়ে শিব মিশ্র দেবতায় পরিণত হয়েছেন।

পৌরাণিক বিবরণে শিবকে অনাদি লিঙ্গ বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে অর্থাৎ শিবের মহিমার কোনো তলদেশ খুঁজে পাওয়া যায় না। ব্রাহ্মণ পুরোহিতের সাহায্য ব্যতীত মেয়েরাও শিব ঠাকুরকে আপন করে নিয়ে সামান্য গঙ্গা জল ও বিল্বপত্র দিয়ে মাটির তৈরি শিবের পূজা অর্চনা করে থাকেন। 'বুড়ো শিবের' 'বুড়ো' আর ধর্মরাজের 'রাজ', দুয়ে মিলে 'বুড়োরাজ'। সাধারণত 'নাথ' বা 'ঈশ্বর' যোগ করেই শিবের নামকরণ হয় এদেশে, 'রাজ' দিয়ে হয় না। জামালপুরে হয়েছে, কারণ সেখানে দুই দেবতা মিলিত হয়ে সর্বজনপূজ্য লোকদেবতায় পরিণত হয়েছেন। হাওড়া-কাটোয়া বা শিয়ালদহ-কাটোয়া রেলপথে পাটুলি একটি স্টেশন। হাওড়া থেকে দূরত্ব ১২৭ কিমি। পাটুলি স্টেশন থেকে ৭কিমি দূরের একটি গ্রাম জামালপুর। পাটুলি স্টেশন থেকে ট্রেকারে বা টোটোতে এই গ্রামে যাওয়া যায়। পাটুলির আগের স্টেশন বেলেরহাট। সেখান থেকেও টোটোতে এই গ্রামে যাওয়া যায়। জামালপুরের গ্রামদেবতা 'বুড়োরাজ' এই অঞ্চলে খুবই প্রসিদ্ধ। আর শুধু এই অঞ্চলে কেন, ভাগীরথীর দুইতীরের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলের আবাল-বৃদ্ধবনিতার তিনি প্রাণের দেবতা। এই অঞ্চলের অনেকেই সন্তানের অন্নপ্রাশনে শিশুর মুখে অন্ন তুলে দেওয়ার আগে বুড়া রাজের প্রসাদ খাওয়ান। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে ধর্মরাজ হলেন বুদ্ধদেবের প্রতিভূ। তাঁর মতে বৌদ্ধদের ত্রিরত্ন (বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ) মতবাদ থেকে ধর্মপূর্ম পূজার উৎপত্তি। আবার অনেকের মতে সূর্যপূজা থেকে ধর্মপূজার উদ্ভব হয়েছে। পৌরাণিক বিবরণে যমকে ধর্মরাজ বলা হয়েছে। সে যাই হোক, ধর্মরাজ বা ধর্মঠাকুর রাঢ়ের তথাকথিত নিম্নশ্রেণিভুক্ত সমাজের (বাউড়ি, বাগদি, হাড়ি, ডোম ইত্যাদি) গ্রামদেবতা। ধর্মঠাকুরের অধিকাংশ সেবায়েত পুরোহিতও ডোম, বাগদি ইত্যাদি অব্রাহ্মণ জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ। বাবা বুড়োরাজের আবির্ভাব সম্বন্ধে একটি কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। জামালপুরের পাশের গ্রাম নিমদহ। এই নিমদহে তখন অনেক সচ্ছল গোপের বাস ছিল। এই সচ্ছল গোপদের মধ্যে যদু ঘোষ ছিলেন অন্যতম। তাঁর শতাধিক গরু-মোষ ছিল। এদের মধ্যে অনেক গুলি ছিল বেশ দুধালো। গাইগুলোর মধ্যে শ্যামলী ছিল সবার উপরে। রাখালরা গরু-মোষ গুলোকে রোজ নিমদহের আশপাশের মাঠে ও বনে-জঙ্গলে চরাতে নিয়ে যেত। বেশ কিছুদিন থেকে দেখা গেল, শ্যামলীর দুধ কর্পূরের মতো উবে যাচ্ছে। রাখালদের উপর যদু ঘোষ বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে গ্রামের ব্রাহ্মণঠাকুর মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়ের কাছে ছুটলেন। যদুর কাছ থেকে সব কথা শুনে চাটুজ্যে মশায় জঙ্গলে গিয়ে দেখলেন, সব দুধ একটি পাথরের মাথায় গিয়ে জমছে। সব দেখে ব্রাহ্মণ ঠাকুর বাড়িতে ফিরলেন। সেই রাতেই তিনি স্বপ্ন দেখলেন। স্বপ্নে কে যেন বলছে, "আমি এখানে আছি। আমার পূজা কর। কিন্তু আমার পূজায় কোনো আড়ম্বর থাকবে না। গরীবের কুঁড়ের মতোই হবে আমার মন্দির।" জঙ্গল পরিষ্কার করে বুড়োরাজের পুজোর ব্যবস্থা হল। গ্রামের বাগদিরা ঘর তৈরি করে দিলেন। চাটুয্যে মশায় পুজো করেন, আর যদু অদূরেদূ হাত জোড় করে বসে থাকেন। পুজোর পর চাটুয্যে মশায় বলেন, 'যদু তোর পুজোই আগে করলাম, ভগবান তোকেই আগে কৃপা করেছেন কি না!' যেহেতু যদুর বাড়ি ছিল নিমদহ গ্রামে, সেজন্য আজও নিমদেহের পুজো বুড়ো রাজের কাছে সবার আগে নিবেদন করা হয়। এই কাহিনি জামালপুরের বিশেষত্ব নয়।

পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব অনাদিলিঙ্গ শিবের উৎপত্তি প্রসঙ্গে এই একই কিংবদন্তি শোনা যায়। জামালপুরের বিশেষত্ব হল, বৈশাখী পূর্ণিমায় বুড়ো রাজের পূজা ও গাজন হয়। শিবের গাজন হয় চৈত্র সংক্রান্তিতে। বৈশাখী পূর্ণিমায় ধর্মরাজের গাজন হয়। তাহলে বুড়োরাজ শিব, না ধর্মরাজ? এর উত্তরে বলতে হয় বুড়োরাজ একাধারে যেমন ধর্মরাজ, আবার তিনি শিবও বটে। বুড়োরাজের পূজা ও আচার-অনুষ্ঠান দেখে মনে হয় অনেক আগে এখানে ধর্মরাজের পূজার প্রচলন ছিল। কোনো কারণে পূজা বন্ধ হয়ে যায়। পরে শিবলিঙ্গের মাধ্যমে পূজার প্রকাশ ঘটে! যার বহিরঙ্গের রূপটি শিবের হলেও আচার-অনুষ্ঠান ধর্মরাজের। বিনয় ঘোষের কথায় বলতে হয়, - ধর্মরাজ থেকে বুড়োশিবে রূপান্তরিত হবার মধ্যপথে সংস্কার ও প্রথার টানে, আপস করে রয়েছেন বুড়োরাজ। ব্রাহ্মণ পুরোহিতের দূরদর্শিতা ও হিন্দুধর্মের অন্তর্নিহিত উদারতার জন্যই এই আপোষ সম্ভব হয়েছে। এই আপস বড়ো উদাহরণ হল : বুড়োরাজের মূল নৈবেদ্য মাঝখান দিয়ে দাগ কেটে দুই ভাগ করা হয়। তার এক ভাগ শিবকে ও অপরভাগ ধর্মরাজকে নিবেদন করা হয়। পূর্বমুখী বুড়োরাজের মন্দিরটি ইঁট-পাথরের মন্দির নয়। মন্দিরের চাল খড়ের। প্রতি বৎসর বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও মাঘ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে বুড়োরাজের

বিশেষ উৎসব ও মেলা উপলক্ষে প্রচুর লোকের সমাবেশ হয়। এর মধ্যে বৈশাখী পূর্ণিমায় লোক সমাগম হয় বেশি। বৈশাখ মাসের মেলাটি পূর্বে এক মাস ধরে চলত। বর্তমানে সব মেলার মতো এ মেলারও স্থায়ীত্ব কমেছে। এখনও নিমদহ থেকে পুজো এলে তবে অন্যের পুজো হয়। এখন যদু ঘোষের বংশের আর কেউ বেঁচে নেই। গ্রামবাসীরাই এখন পুজো পাঠান। চারিদিকে হাজার হাজার লোক লাঠি-রামদা-টাঙি হাতে পাঁঠা নিয়ে মেলায় হাজির হয়। অধিকাংশই হল গোপ ও বাগদি। বলিষ্ঠ চেহারা। মন্দির ছাড়াও সমগ্র অঞ্চলটিতে ঘট স্থাপন করে বুড়োরাজের পূজা করা হয়। পাঁঠা বলির সংকেত পেলেই যে যেখানে থাকে বলি দিতে শুরু হয়। এখন মন্দিরের পিছনের মাঠেই বলি হয়। সাধারণত মন্দিরের সামনে বলি হয় না। শিবের নামেও বলি উৎসর্গ করা হয় না। আগে পাঁঠা কাড়াকাড়ি হত। খুন-জখমও হত। তাই মানতকারীরা দলবদ্ধ ভাবে সশস্ত্র হয়ে আসতেন। এখনও সেই রেওয়াজ চলে আসছে। পাঁঠা কাড়াকাড়ি আজ বর্বরতা বলে মনে হলেও একটা সময় সেটা বীরত্বের খেলা বলে গণ্য হত। যে দলপতি বেশি পাঁঠা কেড়ে ফিরতে পারতেন গ্রামে তাঁকে বিজয়ীর সম্মান দেওয়া হত। মনে রাখতে হবে, তখন এঁরা জমিদার-সামন্তদের অধীনে লাঠিয়াল-সৈনিকের কাজ করতেন। পাঁঠা কাড়াকাড়ি উপলক্ষে লাঠিখেলা হত এবং সেটা ধর্মরাজের উৎসবের একটা প্রধান অঙ্গ। এখনও মন্দিরের সামনে কিছু কিছু লাঠি খেলা হয়। বাবা বুড়োরাজের প্রথম সেবায়ত-পূজক মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়ের শেষ বংশধর হারাধন চট্টোপাধ্যায়ের কোন পুত্র সন্তান ছিল না। তাঁর একমাত্র কন্যার বিয়ে হয় নদিয়া জেলার ধর্মদা গ্রামের গুপিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। এঁদের বাড়ির মন্দিরে আজও গোপীনাথ পূজিত হন। এই গুপিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বংশধরগণ বাবা বুড়োরাজের বর্তমান সেবায়েত পুরোহিত।

বুদ্ধপূর্ণিমায় আজও স্বমহিমায় উজ্জ্বল জামালপুরের বুড়োরাজের মেলা।আমি প্রথম বার এই মেলা দেখলাম ২০২২ সালে। ছোটোবেলা থেকে শুনে আসলেও তেমন সুযোগ হয়নি। তাই আশ্চর্য ও বিস্মিত ও রোমাঞ্চিত হলাম অনেকটাই। হঠাৎ দেখলে মনে হবে, দলবদ্ধ হয়ে বেশ কিছু মানুষ অস্ত্র হাতে যুদ্ধে চলেছে! কারও হাতে রাম দা তো কারও হাতে খাঁড়া। কেউ বা তরোয়াল উঁচিয়ে কিংবা লাঠি নিয়ে। এ যেন ধর্ম নয়, যুদ্ধ ক্ষেত্র। এদের সঙ্গে রয়েছে মানতের পশু। কিন্তু যুদ্ধ নয়! সকলেরই গন্তব্য বর্ধমান জেলার জামালপুরে বুড়োরাজের মন্দির।

বৈশাখী পূর্ণিমা যা বুদ্ধপুর্ণিমা বলেও পরিচিত সে দিনে বর্ধমান জেলার সবুজে ঘেরা ছোটো গ্রাম জামালপুরে বুড়োরাজের মহামেলা। বৈশাখের দাবদাহ উপেক্ষা করে হাজার হাজার মানুষ জড়ো হন এখানে। কেউ এই সব অস্ত্র দিয়ে দেবতার উদ্দেশে বলি দিতে আসেন, তো কেউ বা আবার দলবদ্ধ হয়ে অস্ত্র প্রদর্শন করে বীরত্ব দেখাতে। তাই এই দিনে বদলে যায় পরিচিত গ্রামের ছবিটা। গ্রামে ধুকতেই অনেকটা আগেই গাড়ি আটকে দেওয়া হয়। পুলিশ প্রশাসন থাকে নিয়ত পাহারায়। অন্যান্য প্রচলিত মেলার চেয়ে গ্রামীণ এই মেলা অনেকটাই আলাদা। শহুরে যান্ত্রিক প্রভাব আজও থাবা বসাতে পারেনি এখানে। মন্দির বলতে একটি খড়ের চালাঘর। যার মেঝেটি আজও মাটির। শিব এবং যম-ধর্মরাজের এক মিলিত রূপ এই বুড়োরাজ। বাংলায় বৌদ্ধধর্মের অবক্ষয়ের ফলেই ধর্মরাজের পুজোর প্রচলন ঘটে।

বাংলার অন্যান্য জায়গার ধর্মরাজের বিগ্রহ কূর্মাকৃতি হলেও জামালপুরে বুড়োরাজের বিগ্রহ কিন্তু দু'টি গৌরীপট্ট যুক্ত একটি মূর্তি। তার এক দিকে শিবলিঙ্গ অপর দিকে একটি গর্ত। মাটির কিছুটা নীচে থাকায় এর চেয়ে বেশি বোঝা যায় না। মন্দিরের এক সেবায়েৎ জানালেন- হাজার চেষ্টা করেও সেই বিগ্রহের শেষ পাওয়া যায়নি বলে সেটি সরানো সম্ভব হয়নি।

মৃণালকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থে বুড়োরাজের বিভিন্ন ব্রত পালনে একাগ্র চিত্তে বাবাকে ডাকলে ভক্ত প্রত্যাদেশ পান। আবার সন্তান বা অন্য কিছুর কামনায় ভক্তরা মন্দিরের পাশের অশ্বত্থ গাছের ডালে নুড়ি বেঁধে দেন। কামনা পূর্ণ হলে বাবার পুজো দিয়ে নুড়ি খুলে দিয়ে যান। অনেকে মনস্কামনায় বাবার মাথায় ফুল চড়ান। বাবার মাথা থেকে ফুল পড়লে মনস্কামনা সম্পর্কে নিশ্চিত আদেশ জানা যায়। কঠিন ব্যাধি থেকে মুক্তির জন্য অনেকে দন্ডি কাটার মানসিক করেন। রোগমুক্তির পর বাবার পুকুরে স্নান করে ভিজা কাপড়ে মন্দির পর্যন্ত দন্ডি কাটেন। শিবরাত্রিতে মন্দিরে সারারাত পূজাপাঠ ও ভক্ত সমাগম হয়। শিবরাত্রি পালনকারী আগেরদিন নিরামিষ খাবেন। রাতে চার প্রহরে চারবার বা একবারেই চারবার

পুজো করবেন। প্রথম প্রহরে দুধ, দ্বিতীয় প্রহরে দই, তৃতীয় প্রহরে ঘি ও চতুর্থ প্রহরে মধু দিয়ে স্নান করিয়ে যথাবিহিত নিয়মে পুজো করতে হয়। পরের দিন ব্রাহ্মণকে খাইয়ে পারণ করতে হয়। শিবের গাজনের ন্যায় বুড়োরাজের গাজন চৈত্র মাসে হয় না, বৈশাখী পূর্ণিমায় বুড়োরাজের গাজন হয়। জাতি-ধর্ম-র্মনির্বিশেষে যে কেউ সন্ন্যাসী হতে পারেন। মূল সন্ন্যাসীকে এক মাস ধরে হবিষ্যান্ন খেতে হয়। অন্যান্যেরা পূর্ণিমার পাঁচদিন বা সাতদিন আগে কামায়। কামানের দিন একবেলা নিরামিষ আহার ও পরদিন উত্তরীয় পরিধান উপলক্ষে হবিষ্যান্ন খান। ত্রয়োদশীতে সারাদিন উপবাস করে পুজোর পর রাতে ফলাহার গ্রহণ। এদিন গাজন বের হয়। চতুর্দ্দশীর দিন সারাদিন উপবাস থেকে সন্ধ্যায় বাণ ফোঁড়ানর পর তরল খাদ্য গ্রহণ করা যায়। পূর্ণিমা র দিন নিরামিষ খেতে হয়। প্রতিপদের দিন সেবায়েত ও মূলসন্ন্যাসী উত্তরীয় খুলে দেওয়ার পর বাবার মাথায় সন্ন্যাসীদের মঙ্গলকামনায়, মূলসন্ন্যাসীর উপস্থিতিতে ফুল চাপানো হয়। বাবার মাথা থেকে ফুল পড়লে সন্ন্যাসীদের ক্রিয়ার পরিসমাপ্তি ঘটে। যাত্রী, ভক্ত ও মানসিকদাতারা অনেকেই বুড়ো রাজের কাছে আসেন প্রধানত রোগমুক্তির আশায়। লোকের বিশ্বাস যক্ষা, মৃগী, বাত, অম্লশূল ইত্যাদি যে কোনো কঠিন ব্যাধি বুড়ো রাজের কৃপায় সেরে যায়। তাঁদের আরও বিশ্বাস, বহু ক্ষেত্রে চিকিৎসকগণ রোগ সারাতে অপারগ হলেও বাবার কৃপায় রোগমুক্তি ঘটে।

শক্তির কাছে বলিদানের বিধি আছে। কিন্তু শূয়োর বলি নয়। বুড়োরাজের মন্দিরের একপাশে হাড়িরা শূয়োর বলি দেয়, কোনো বাধা নেই। 'বুড়ো রাজে'র জয়ধ্বনি করেই গোপ ও ব্যগ্রক্ষত্রিয়রা হাজার হাজার পাঁঠাবলি দেয়, তাতেও কোনো বাধা নেই। গ্রাম-গ্রামান্তরের মুসলমানরাও পাঁঠা মানত করে, কোনো সংস্কার নেই। সর্বসংস্কারমুক্ত উদারতার প্রতীক 'বুড়ো রাজ' বাংলার নিজস্ব মানবধর্মের প্রতিমূর্তিমূর্তি।

এবার আমরা ধীরে ধীরে পৌঁছে গেলাম একদম মূল মন্দিরের কাছে। মন্দিরে ঢোকার মুখে এখন সুদৃশ্য তোরণ তৈরি হয়েছে। সেখানে শিবপার্বতী গণেশ এর মূর্তি সহ একদিকে সিংহ অপরদিকে ষাঁড়ের প্রতিকৃতি। কাছে যেতেই লক্ষ করা গেল প্রচুর পূজার বাটার দোকান, ফুল বেলপাতা ফল ছাঁচ বাতসা কলা ধুতরা ফুল প্রভৃতি সহযোগে পূজার উপকরণ সাজানো হয়েছে। বহু মানুষ নিকটস্থ স্থানের ঘাট থেকে স্নান সেরে দণ্ডি কেটে মূল মন্দিরে আসছেন। মন্দিরের প্রবেশ পথ সরু। সেখানে পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য পৃথক পথের ব্যবস্থা। সেখানে ঘন্টা বাধা আছে। মন্দিরের গায়ে অনেক ফলক লাগানো আছে। সেখানে অনেকেই তাদের প্রিয়জনদের নাম লিখে রেখেছেন বাবা বুড়োরাজের মন্দিরের গায়ে। মন্দিরটি খড়ের চালা বিশিষ্ট। মাটির মেঝে। প্রাচীন বিশ্বাসে আজো মন্দিরের আধুনিক সংস্কার সাধিত হয় নি। অনেকেই গোপাল নিয়ে আসেন। সাধুদের মেলা বসে যায়। স্থানীয় গাছের অংশে পাথর বেঁধে রাখার চল আছে। কয়েকজন মহিলাকে দেখলাম তারা নিজেদের বাড়ির শিব নিয়ে এখানে পূজা দিয়েছেন এবং প্রদর্শন করে বসে আছেন। এক কথায় স্থানের মাহাত্ম্য ও বিশ্বাস এসব দৃশ্য দেখে অনেকটাই বেড়ে যায়।

আবার অন্য দিকে দেখা যাবে, দলবদ্ধ হয়ে বেশ কিছু মানুষ বিভিন্ন অস্ত্র হাতে যেন যুদ্ধে এসেছে! কারও হাতে রাম দা তো কারও হাতে খাঁড়া। কেউ বা তরোয়াল উঁচিয়ে কিংবা হেসো জাতীয় অস্ত্র নিয়ে এগিয়ে চলেছে। সঙ্গে রয়েছে অনেক বন্ধুবান্ধব ও মানতের পশু। পাঁঠা, ভেড়া এবং খাসি জাতীয় ছাগল। বৈশাখের দাবদাহ উপেক্ষা করে হাজার হাজার মানুষ জড়ো হন এখানে এই মহা মেলায়। এরা দলবদ্ধ হয়ে অস্ত্র প্রদর্শন করে বীরত্ব দেখান এবং দেবতার উদেশ্যে পশু বলি দেন। তাই এই দিনে বদলে যায় পরিচিত গ্রামের ছবিটা। ছোটোবেলা থেকে দেখে বা শুনে আসা জামালপুরের মেলা স্বচক্ষে দেখে সে কথায় মনে হল আজ। পূজার ক্ষেত্রের বাইরে হাড়িকাঠ। লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা। সেখানেই যত আমোদিত মানুষের ভিড়। রক্তে ভেসে যাচ্ছে ময়দান। আগের দিন রাত থেকেই চলছে এই বীভৎস পশু নিধনের প্রতিযোগিতা। একে একে চলছে পশু নিধনের যজ্ঞ। বিবিধ অস্ত্র হাতে সেই সব বীর সম্প্রদায় যেন ক্ষেপে উঠেছে এক আদিম উন্মাদনায়। বর্তমানে মন্দিরের সামনে বলি বন্ধ হয়েছে, মন্দিরের থেকে একটু দূরে নতুন ব্যবস্থা। তবে প্রায় সমস্ত বলিই হয় মন্দিরের পিছনের বিশাল খোলা মাঠে। উদ্দামতা থাকলেও এখন তা অনেক সংযত, প্রশাসন ও মন্দির কর্তপক্ষের উদ্যোগে হানাহানিও বন্ধ হয়েছে।

অন্যান্য প্রচলিত মেলার চেয়ে গ্রামীণ এই মেলা অনেকটাই আলাদা তার বৈশিষ্ট্যে। শহুরে যান্ত্রিক প্রভাব আজও থাবা বসাতে পারেনি এখানকার মন্দির ও মেলায়। পূর্বে বলেছি, মন্দির বলতে একটি খড়ের চালাঘর। এটি চার চালা

বিশিষ্ট। যার মেঝেটি আজও মাটির। ভক্তের গায়ের জল আর পায়ের ছাপে স্থানটি কর্দমাক্ত হয়ে ওঠে। মূর্তিটি জলের নীচে আংশিক ডুবে থাকে। এই মূর্তির উপরে পুরোহিত সম্প্রদায় এই বিশেষ পূজার দিনে পাথররের প্রতীক মূর্তির উপরে মাচা বেঁধে বসেন। শিব এবং যম-ধর্মরাজের এক মিলিত রূপ এই বুড়োরাজ। বাংলায় বৌদ্ধধর্মের অবক্ষয়ের ফলেই ধর্মরাজের পুজোর প্রচলন ঘটে।

বাংলার অন্যান্য জায়গার ধর্মরাজের বিগ্রহ কূর্মাকৃতি হলেও জামালপুরে বুড়োরাজের বিগ্রহ কিন্তু দু'টি গৌরীপট্ট যুক্ত একটি মূর্তি। তার এক দিকে শিবলিঙ্গ অপর দিকে একটি গর্ত। মাটির কিছুটা নীচে থাকায় এর চেয়ে বেশি বোঝা যায় না। মন্দিরের এক সেবায়েৎ জানালেন, আনুমানিক ছ'শো বছর আগে এই অঞ্চল ছিল ঘন জঙ্গলে ঢাকা। সেই জঙ্গলে ছিল এই পাথরের মূর্তিটি। শোনা যায়, প্রতি দিন একটি লাল রঙের গোরু সেই পাথরের উপর এসে দাঁড়াত। আর আপনা থেকেই পাথরের উপরে দুধ ঢালত। সেই গোরুর মালিক যদু ঘোষ এক দিন তার পিছু নিয়ে এই আশ্চর্য ঘটনা দেখে অবাক হয়েছিলেন। সেই রাতে তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, ওখানেই দেবতার অধিষ্ঠান। পর দিন সেখানে খোঁড়াখুঁড়ি শুরু করে শিবলিঙ্গ-গৌরীপট্ট সমেত পাথরের অদ্ভুত এক বিগ্রহ পাওয়া যায়। কিন্তু, হাজার চেষ্টা করেও সেই বিগ্রহের শেষ পাওয়া যায়নি বলে সেটি সরানো সম্ভব হয়নি। সেই দিন রাতে যদু ঘোষ পুনরায় এবং ওই গ্রামের এক ব্রাহ্মণ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় স্বপ্নাদেশ পান যে, সেই বিগ্রহটিকে ওই স্থান থেকে কিছুতেই সরানো সম্ভব নয়। তাই সেখানেই তাঁকে প্রতিষ্ঠা করে নিত্যপুজোর ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু, গরিব সেই ব্রাহ্মণের পক্ষে নিত্যপুজোর ব্যয়ভার গ্রহণ করা আদৌ সম্ভব ছিল না। তখন আবারও তিনি স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন যে প্রতিদিন তিন সের চাল আর দুধ দিয়ে পুজো করলেই হবে। সেই থেকে প্রতিদিন একটি থালায় তিন সের চালের নৈবেদ্য দিয়ে পুজো হয়। আর মাঝখানে একটা দাগ দেওয়া হয় পৃথক করার জন্য। একাংশ শিবের উদ্দেশ্যে আর এক অংশ যম- ধর্মরাজের উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হয় এই নৈবেদ্য। তবে, বিশেষ তিথিতে পরমান্ন ভোগ হয়। কাঠের জ্বালে পাঁচ কেজি দুধের সাথে ৫০০ গ্রাম আতপ চাল ও এক কেজি চিনি সহযোগে বাবার ভোগ রাঁধা হয়। জামালপুরের স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, বিগ্রহটি বৌদ্ধ যুগের। মূলত অনার্য এবং বৌদ্ধ সংস্কৃতির মেলবন্ধনেই নাকি বাংলায় ধর্মপুজোর প্রচলন ঘটেছিল। প্রচলিত কাহিনি অনুসারে সেই ব্রাহ্মণ যে দিন স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন সে দিন ছিল বুদ্ধপূর্ণিমা। তাই, প্রতি বছর সেই দিনটিতে এখানে বসে বিরাট মেলা। মন্দিরের এক সেবায়েৎ বলছিলেন, যম-ধর্মরাজের উদ্দেশ্যেই এই বলিদান। বিপদে পড়ে কিংবা কোনও গভীর সমস্যা থেকে মুক্তি পেতেই মানুষ দেবতার কাছে কিছু মানত করে। বিপন্মুক্ত হলে তারা দেবতার উদ্দেশে পশুবলি দেয়। কেউ অন্য কিছু দান করে। যদিও সময়ের সঙ্গে পশুবলি আগের তুলনায় কমেছে। তবে, বাংলার অন্যান্য মেলায় অবক্ষয়ের ছবি দেখা গেলেও এখানে আজও দেখা যায় মেলার সাবেক ছবিটা। মেলা চলে মাসখানেক। স্থায়ী দোকানের পাশাপাশি অস্থায়ী দোকানও হয় এখানে। এখানে কেউ আসেন ভক্তিতে, কেউ বা মেলার আকর্ষণে। 'বুড়োরাজের জয়' ধ্বনি মুখরিত আকাশ বাতাস পরিবেশও যেন ভক্তদের মনের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। আজও সরল মানুষের বিশ্বাস বুড়োরাজের দরবারে এসে অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটে। আর সেই বিশ্বাস নিয়ে শ্রেণি-বর্ণ নির্বিশেষে হাজার হাজার মানুষ এই সময় সন্ন্যাস পালন করেন। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে মানুষের সরল ধর্মীয় বিশ্বাস আর লৌকিক কিংবদন্তির মাঝে আজও স্বমহিমায় উজ্জ্বল জামালপুরের বুড়োরাজ।

শ্রাবণ মাসের প্রতি সোমবার পূর্বস্থলীর জামালপুরে বুড়োরাজ মন্দিরে পুণ্যার্থীদের ঢল নামে। পুজো দিয়ে যায় হাজার হাজার পুণ্যার্থী।শ্রাবণের শেষ সোমবার বুড়োরাজ মন্দির এ বিপুল ভক্তের সমাগম হওয়ায় খুশি স্থানীয় ব্যবসায়ীরা সহ গ্রাম বাসীবৃন্দ।ভিড় সামাল দিতে উপস্থিত ছিলেন বহু পুলিশ আধিকারিক এবং নিরাপত্তায় প্রচুর পুলিশ।একদিকে ছিল ইদুজ্জোহা আর অন্যদিকে বুড়োরাজ মন্দির এ প্রচুর ভক্তের সমাগম।শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ওই মন্দিরে অস্ত্র নিয়ে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। কিন্তু সে কথা কার কানে আসে। জামালপুর তার সহজাত চেহারায় থাকতে ভালোবাসে।মন্দির চত্বরে টাঙিয়ে দেয়া হয়েছিল নোটিশ।মন্দিরের সেবায়েত প্রবীর বন্দ্যোপাধ্যায় কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সৌভিক বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দিয়েছেন যে শ্রাবণ মাসের শেষ সোমবার হাজার হাজার পূণ্যার্থী সমাগম হয়ে থাকে ইতিমধ্যেই নদিয়া মুর্শিদাবাদ হুগলি বীরভূম জেলা থেকে হাজার হাজার পূণ্যার্থী এসেছিল পুজো দিতে।

শিবের মাথায় জল ঢেলে পুজোর দিয়েছেন ভক্তরা। কয়েকশো বছরের পুরনো মন্দির হল বুড়োরাজ এর মন্দির।এক সময় এই এলাকা ছিল জঙ্গলে ভরা কথিত জঙ্গলে বুড়োরাজ শিবলিঙ্গের সন্ধান পাওয়া যায়।কষ্টি পাথরের মূর্তি নিয়ে একটি ঘরের চালা মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয় শিবলিঙ্গ সেই থেকে আজও পুজো হয়ে আসছে জামালপুরের বুড়োরাজ ধর্মরাজার পুজো হিসেবেও এলাকার মানুষ জানেন। অনেকেই জানাচ্ছেন যে বহু বিপদ এবং জটিল রোগের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে থাকেন ভক্তরা। মানত করলে ফল পাওয়া যায় এবং তাই বিশ্বাস মন্দিরে আসা ভক্তদের।বুদ্ধ পূর্ণিমা ও মাঘী পূর্ণিমায় বুড়োরাজ এর বিশেষ পুজো হয়ে থাকে। তবে বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে সব থেকে বড়ো পুজো ও বিশাল মেলা বসে এখানে। নিত্য পূজা যেমন হয় তেমনি ভক্তরা প্রতি সোমবার এই এসে পুজো দিয়ে যান।স্থানীয় বাসিন্দারা জানান যে, বুড়োরাজার মাথায় জল ঢেলে পুজো দিয়ে থাকেন ভক্তরা। তারপর দুধ ও গঙ্গাজল দিয়ে থাকে।তাই শ্রাবণের শেষ সোমবার ভক্তের ঢল এ জমজমাট ছিল বাবা বুড়োরাজ এর মন্দির।

অন্য দিক থেকে গাড়িতে কলকাতা থেকে কল্যাণী রোড ধরে ঈশ্বর গুপ্ত সেতু পেরিয়ে বাঁশবেড়িয়া হয়ে দিল্লি রোড ধরে সমুদ্রগড়, কালনা পেরিয়ে পৌঁছনো যায় বর্ধমান জেলার জামালপুরে। কিংবা হাওড়া থেকে কাটোয়া লোকালে পাটুলিতে নেমে ট্রেকারে বা ভ্যানে যাওয়া যায় এখানে জামালপুর। তাছাড়াও যাতায়াত পথ আছে অনেক গুলি। ট্রেনে আসা যায় শিয়ালদহ থেকে,হাওড়া কাটোয়া লোকাল ট্রেনে উঠতে হবে বেলেরহল্ট অথবা পাটুলি স্টেশনে নেমে অটো এবং টোটো করে আসতে হবে এই মন্দিরে।আসানসোল থেকে বর্ধমান কাটোয়া লোকাল ট্রেনে উঠতে হবে ।অথবা ব্যান্ডেল থেকে আসলে ব্যান্ডেল কাটোয়া লোকাল ধরতে হবে। পাটুলি অথবা বেলেরহল্ট স্টেশনে নেমে অটো এবং টোটো করে আসতে হবে এই মন্দিরে।কৃষ্ণনগর থেকে গাড়িতে এই মন্দিরে আসতে জামালপুরে বাস ধরতে হবে অথবা হেমাতপুর থেকে অটো করে জামালপুর মন্দিরে পৌঁছতে পারবে।কোলকাতা থেকে কালনা কাটোয়া রোড ধরে পারুলিয়া অথবা ছাতনী এসে পৌঁছতে পারবে এই মন্দিরে। আসানসোল থেকে বর্ধমান থেকে কাটোয়া হয়ে ছাতনী এসে এই মন্দিরে পৌঁছতে পারবে। অথবা শর্ট রাস্তা হল বর্ধমান থেকে কুসুমগ্রাম হয়ে সোমোসপুর এসে পৌঁছতে পারবে এই মন্দিরে।

সহায়ক গ্রন্থ :

১. ঘোষ, বিনয় : পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি।
২. চৌধুরী, যজ্ঞেশ্বর : বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি (৩য় খন্ড)।
৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃণালকান্তি : শিব মাহাত্ম্য ও শ্রীশ্রীবুড়োরাজ কথামৃত।
৪. ঘোষ, শ্যামলকুমার ঘোষ : বাবা বুড়োরাজ মন্দির জামালপুর, ওয়েবসাইট।
৫. রায়, রিয়া দাস : জামালপুরের এক প্রাচীন নিদর্শন বাবা বুড়োরাজের মন্দির, ওয়েবসাইট।
৬. ব্যানার্জী, অশোক, জামালপুর।